International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
Volume-I, Issue-I, July 2014
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com

ভারতে সর্বধর্ম সমন্বয় ও শ্রীরামকৃষ্ণ : আধুনিক দৃষ্টিকোণে

ড. অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়
অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, নহাটা যোগেন্দ্রনাথ মন্ডল স্মৃতি মহাবিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ

Abstract

Thakur Ramkrishna Paramhansadev was that divine soul whose magical lessons have exerted great influence upon the people not only in India but also in the whole world. The 'Lokayata Siksha' of Thakur Ramkrishnadev on religion like 'Jata Mot Toto Poth' (As different views, so different paths) reflects the divergent ways of worship to reach in the same destination. He proved that humanity is the best religion above all religions, castes and classes. The lesson taught by him proved that one can achieve the eternal soul by different way of devotional practice and power of worship. Moreover, Ramkrishnadev also tried by himself in his lifetime to know the spiritual truth of life through different ways of practices guided by the people of different religions. He realized that the coordination of all religions under the single roof of society can make this world as a world of love to humanity. To serve the poor, ill and distressed people was the main mission of Thakur Ramakrishna, as is reflected in the workings of his great disciple Swami Vivekananda. Adopting a modern perspective, this paper attempts to highlight the importance of Sri Ramakrishna in religious integrity in India.

Key Words: Religion, Society, Humanity, Ramakrishna, Religious Integrity.

সর্বে হি সুখং বাঞ্ছন্তি তচ্চ ধর্ম সমুদ্ভবম্।
তস্মাদ্ধর্মো সদা কার্য্যো সর্ব বর্ণেঃ প্রযত্নতঃ।। (দক্ষ সংহিতা)

অর্থাৎ সকলে সুখ ইচ্ছা করে, সুখে থাকতে কার না সাধ হয়? কিন্তু সেই সুখ আসে ধর্ম থেকে। অতএব সমস্ত বর্ণের (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শুদ্র) মানুষের ধর্ম পালন করা উচিত। প্রাচীন ভারতে সত্যদ্রষ্টা ঋষিরা ঘোষণা করেছিলেন "একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি" – অর্থাৎ যিনি আছেন তিনি এক, জ্ঞানীরা তাঁকে বহু নামে অভিহিত করে থাকেন। ভারতের প্রাচীনতম ধর্মগ্রন্থ ঋগ্বেদে অদ্বিতীয় পরম ব্রহ্মের একত্ব নীতিকে প্রতিষ্ঠা দেওয়া হয়েছিল। ঈশ্বর এক এবং অদ্বিতীয় তথাপি তিনি বিভিন্ন জাতির দ্বারা বিভিন্ন নামে আরাধিত হয়ে থাকেন। আর ধর্ম প্রবর্তক অবতার পুরুষগণ যুগে যুগে অবতীর্ণ হয়ে ধর্মের গ্লানি থেকে বিশ্ব ও বিশ্বমানবতাকে রক্ষা করে চলেন।

বৃহত্তর অর্থে সকল জড় ও জীবের আলাদা আলাদা ধর্ম আছে। আগুনের ধর্ম দগ্ধ করা আবার জলের ধর্ম হলো নিম্নগামী হওয়া। 'ধৃ' ধাতুর সঙ্গে 'ম' (মন)-ক প্রত্যয় যোগে 'ধর্ম' শব্দটি এসেছে যার মূল অর্থ হলো 'ধারণ করা' বা 'ধরে রাখা'। গীতা বা সংহিতায় ধর্মের যা ব্যাখ্যা দেওয়া হয় তাতে স্পষ্ট যে মানুষের বেঁচে থাকা ও বেড়ে ওঠার বিষয়ে ধর্ম তার সহায়ক শক্তি হিসাবে কাজ করে। 'ধর্ম' কথাটির সঙ্গে ঈশ্বরতত্ত্ব ও ঈশ্বর সাধনার বিষয়টিকে যুক্ত করে কালে তৈরি হয়েছে হিন্দুধর্ম, বৌদ্ধধর্ম, জৈনধর্ম, খ্রীষ্টানধর্ম, কনফুসিয়াসধর্ম, ইহুদীধর্ম, পারসিকধর্ম (পার্সিধর্ম), ইসলামধর্ম প্রভৃতি। মানুষের সাথে অন্যান্য জীবের ধর্ম বিষয়ে পার্থক্য আছে ঠিকই কিন্তু মানুষের ধর্মীয় ব্যাপ্তি বা আধ্যাত্মিক মার্গের উদারতা যে প্রভাবিত করতে পারে তাবৎ জীবকূলকেও স্বামী বিবেকানন্দের ভাবনাতেই মেলে তার সন্ধান ('জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর')।

জগতের সকল ধর্মমতগুলির মধ্যে প্রাচীনতম হলো হিন্দুধর্ম। হিন্দুধর্মের প্রধান শাস্ত্র হলো বেদ। এছাড়া প্রস্থান ত্রয় অর্থাৎ উপনিষদ, শ্রীমদ্ভগবৎগীতা এবং বেদান্ত দর্শনে হিন্দুধর্মে সর্বোচ্চ স্থান দেওয়া হয়। আত্মা ও ব্রহ্মের অভেদত্ব এবং সৎ-চিৎ-আনন্দের উপলব্ধি হিন্দুধর্মের পরম উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য। তীর্থযাত্রা, উপবাস, মূর্তিপূজা ইত্যাদি হিন্দুধর্মের বৈশিষ্ট্য। বেদান্তে জ্ঞানযোগ (বিচারাত্মক), ভক্তিযোগ (ভাবাত্মক) ও কর্মযোগের (শ্রমাত্মক) কথা বলা হয়। তবে ধ্যানের মাধ্যমে ঈশ্বরোলব্ধির উৎকৃষ্ট উপায় হিসাবে রাজযোগকে হিন্দুধর্মে প্রাধান্য দেওয়া হয়। চতুরাশ্রম, চর্তুবর্ণ হিন্দুধর্মের সামাজিক ভিত্তি স্বরূপ। হিন্দুধর্মকে জাতীয় জীবনের সর্বোচ্চ করেছিলেন ভারতের প্রাণপুরুষ স্বামী বিবেকানন্দ। তাঁর জ্ঞানযোগ, কর্মযোগ ও রাজযোগ পদ্ধতি ও ব্যবহারিক জীবনে বেদান্তের অনুশাসণগুলির সরল প্রয়োগ তথা নীতি ও আদর্শগুলি হিন্দুধর্মে নবরূপ প্রদান করেছিল। তাঁর জীবসেবার সাথে সমাজ সংস্কার, শিক্ষার সাথে জাতীয়তাবাদ সর্বত্রই বেদান্তের অভিনব প্রয়োগ যে হিন্দুধর্মের এক মহোত্তম রূপান্তর ঘটিয়েছিল সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

পৃথিবীর সকল ধর্ম মতের মধ্যে হিন্দুধর্ম আদি, অকৃত্রিম ও সনাতন। হিন্দু, জরথ্রুষ্টীয় ও ইহুদী এই তিন ধর্মই প্রাগৈতিহাসিক যুগ হতে বর্তমান রয়েছে। ইহুদী ধর্ম তৎপ্রসূত খৃষ্টধর্মকে আত্মসাৎ করা তো দূরের কথা তা থেকে এক সময় নিজেই বিদায় নিয়েছে। যৎসামান্য পারসী জাতি এখনও জরথ্রুষ্টীয় ধর্মের সাক্ষিস্বরূপ রয়েছে। অন্যদিকে শতাব্দীর পর শতাব্দী ব্যাপী ভারতবর্ষ জুড়ে সনাতন হিন্দুধর্মের প্রভাব পড়েছে জাতিতে-জাতিতে, সম্প্রদায়ে-সম্প্রদায়ে প্রধানতঃ দুটি কারণে। প্রথমতঃ বেদোক্ত হিন্দুধর্মের ভিত্তি ও বিস্তারের মধ্যে যে উদারতা ও গ্রহণযোগ্যতাকে প্রত্যক্ষ করা যায় তা মহৎ ও উচ্চ আধ্যাত্মিক ভাবের পরিমন্ডলকে সৃষ্টি করেছে যা সকল জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে মানুষের কাছে শিক্ষনীয় বিষয় এবং দ্বিতীয়তঃ বেদ ও বেদান্তের মহোচ্চ আদর্শ ও আধ্যাত্মিক সত্যগুলিকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য যে সকল অবতার বিশেষ ভারতবর্ষের বুকে অবতীর্ণ হয়েছিলেন তাঁদের বিশুদ্ধকর্ম ও জীবনাচরণ। হিন্দুধর্মের সর্বোৎকৃষ্ট বেদান্ত জ্ঞান থেকে শুরু করে বৌদ্ধতন্ত্রের অজ্ঞেয়বাদ, জৈন ধর্মাশ্রিত নিরীশ্বরবাদ ইত্যাদি সকল বিষয়ই হিন্দুধর্মের সম্পদ। আপ্তবাক্য বেদ থেকে প্রাচীন মহাত্মাগণ তাঁদের ধর্ম লাভ করেছিলেন এবং অপৌরুষেয় বেদকে তাঁরা অনাদি ও অনন্ত বলে বিশ্বাস করতেন। যুগ থেকে যুগে, কাল থেকে কালে আধ্যাত্মিক জগতের যে নিয়মগুলিকে ভারতবর্ষীয় ঋষি সম্প্রদায় প্রত্যক্ষ করেছিলেন তাঁরা ছিলেন প্রকৃত অর্থেই সত্যদ্রষ্টা দার্শনিক। কালচক্রের ধারায় ঋষিকূলের দ্বারা প্রাপ্ত দিব্যদর্শনের ফল এই সকল সত্য উপলব্ধিগুলিই যে বেদাশ্রিত হিন্দু ভিত্তি প্রস্তুত করেছিল তার আর বলার অপেক্ষা রাখেনা।

আবহমান কাল ধরে চলে আসা ভারতীয় সনাতন হিন্দুধর্ম পরমধর্মগুলিকে তার বুকে সাদরে গ্রহণ করেছে। তাদের মধ্যে সাদৃশ্যও লক্ষণীয়। জোরোয়াস্তার প্রবর্তিত পার্সি ধর্মেও সমাজে মৃত্যুই জীবনের শেষ কথা নয়, মৃত্যুর পরও আত্মার অস্তিত্ব থাকে এবং কর্মানুসারে তার সৎ বা অসদ্গতি হয়ে থাকে এমত স্বীকার করা হয়। এ বিষয়ে বেদ ও আবেস্তা উভয়েই একই ভাবে জীবনব্যাপী মনে প্রাণে সৎকর্মানুষ্ঠান সম্পাদন, চারিত্রিক শুচিতা, পরদুঃখকাতরতা, আত্মনির্ভরশীলতা, সৎচিন্তা, সৎ বাক্য, নারীর মর্যাদা প্রভৃতি বিষয়ের উপরে জোর দেয়। উপনয়ন, যজ্ঞ, পুরোহিত প্রভৃতির উল্লেখ, উভয়েই আছে। ভাষাগত সাদৃশ্য ছাড়াও বেদের যজ্ঞ, মন্ত্র, মিত্র, অসুর, সোম, সবন প্রভৃতি শব্দ আবেস্তায় যথাক্রমে যসন, মন্থ্র, মিথ্র, অহুর, হত্তম, হবন রূপে প্রকাশিত। ঐতিহাসিক ভাবে একথা সত্য যে, ইরানীয় ও ভারতীয় আর্যেরা একসময় একই গোষ্ঠীভুক্ত ছিলেন। আর্য -> আরিয় -> এরিয়ান -> ইরান এইভাবে পরিবর্তনের যে ইঙ্গিত আমরা বাংলা ভাষাতত্ত্বে পাই তাতে প্রমাণিত হয় যে পারস্য দেশের যে আর এক নাম ইরান সে শব্দটিও প্রকৃতপক্ষ্যে আর্য শব্দ থেকেই উদ্ভূত হয়েছে। আমাদের আর্য পূর্বপুরুষগণ তাঁদের ইরানী বা পার্সি ভ্রাতৃবন্দকে অতি সহজেই বরণ করে নিয়েছিলেন সুদূর অতীতে। পারস্য দেশ মুসলমান শাসকদের দ্বারা বিজিত হলে পার্সিরা ভারতবর্ষে এসে আশ্রয় গ্রহণ করে। স্বামী বিবেকানন্দও তাঁর শিকাগো বক্তৃতায় পার্সি ধর্মকে মহান জরথুস্ত্র ধর্ম বলে অভিহিত করেছেন। ইউরোপের বহু মনীষীও জরথুস্ত্র ও তাঁর মহান আদর্শের প্রতি অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। এ থেকে ভারত তথা হিন্দুধর্মের মানুষের কাছে পরধর্মের প্রতি নিষ্ঠা ও ধর্মনিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি যে সুদূর অতীত কাল থেকেই বর্তমান ছিল একথা আবারও প্রমাণিত হয়।

জৈনধর্ম ও বৌদ্ধধর্মের মধ্যে কোনো বিশেষ বৈসাদৃশ্য নেই। বস্তুতঃ উভয়ধর্মই অনেকাংশে হিন্দুধর্মের মতবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। উভয় ধর্মের 'কর্মবাদ' এবং বৌদ্ধধর্মের 'আত্মার দেহান্তরবাদ' হিন্দুধর্ম থেকে কোনো অংশেই বিচ্ছিন্ন নয়। ত্রিরত্নে খচিত বৌদ্ধধর্ম। বৌদ্ধধর্মের মূল কথা হলো বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘ। যে বৈদিক এবং ঔপনিষদিক ব্রাহ্মণ্যধর্মের ভাব ও দর্শনে বৌদ্ধধর্ম একদা ফলবান হয়েছিল তা একান্ত ভাবেই আর্য ধর্মাশ্রিত ও আর্য সাধনারই ফল। গৌতম বুদ্ধের চতুরঙ্গ সত্য ও জন্মান্তরবাদ আর্যঋষিদের বেদান্তবাদেরই উত্তর ফলশ্রুতি বলা যেতে পারে। বৌদ্ধ সাধনায় জীবনের চরম পরিণতিকে বলা হয়েছে 'নির্বাণ'। এই নির্বাণ নেতিবাচক নয়, তা 'অনির্বচনীয় আনন্দ প্রাপ্তি'র অপর নাম। অন্যদিকে বেদ শাস্ত্রে বলা হয় 'বাক্য মনের দ্বারা যাঁকে প্রকাশ করা যায় না, তিনিই ব্রহ্ম'। সুতরাং 'নির্বাণ' ও 'ব্রহ্মত্ত্ব' একই অবস্থা লাভের দুটি ভিন্নরূপ মাত্র। দুটি অবস্থাই অবাঙ্মনসগোচর, অবাচ্য, অনিদর্শন, অপ্রতিষ্ঠ, অনাভাস ও অনিকেত। গীতার অনুশাসন ও বুদ্ধের জীবনদর্শন উভয় ক্ষেত্রেই প্রেমময় দয়াদাক্ষিণ্য, মৈত্রীমূলক কল্যাণব্রত, নিরাসক্তি ও নির্বাসনার কথা বলা হয়েছে। তবে সেবাধর্মের গুণে বুদ্ধদেব ব্রাহ্মণ-শাসিত আর্যধর্মকে অনেকাংশেই অতিক্রম করে গেছেন।

বুদ্ধদেব স্বয়ং ছিলেন নিবৃত্তিমার্গী-অজ্ঞেয়বাদী। বেদাশ্রিত হিন্দুধর্মের সঙ্গে তাঁর অনেকক্ষেত্রে বিরোধ ছিল। বেদের বাহ্য কর্মবাদের পরিবর্তে তিনি স্থান দিয়েছিলেন আন্তর কর্মবাদের। বেদের যাগযজ্ঞ, ক্রিয়াকলাপ অথবা চার্তুবর্ণ-সমাজ-বিধানের বিরোধী হওয়া স্বত্ত্বেও বেদের জ্ঞানকান্ডের সারাংশের সাথে বুদ্ধের ভাবনার বিশেষ কোনো পার্থক্য নেই। বুদ্ধের অনাত্ম (অনাত্ত) বাদ যেমন বেদান্তবাদী ভারতীয়রা আন্তরিক অর্থেই মেনে নিতে পারেননি তেমনি তাঁর জীব প্রেম বা জীবে দয়া, জাতিভেদ বিলোপ সহ অনেক সংস্কারই ভারতীয় তথা হিন্দুদের আপ্লুত করেছে। বৌদ্ধসংঘের প্রভাবে স্থাপিত হয়েছে হিন্দু সাধু সংঘ। স্বামীজী একস্থানে বলেছেন :

> "বৈদিক পৌরোহিত্যের বিরুদ্ধে নবোলথিত ক্ষত্র শক্তির বিদ্রোহের নামই বৌদ্ধধর্ম। বৌদ্ধধর্ম হিন্দুধর্মের পূর্ণ পরিণতি।"(জগতের ধর্মমত, পৃঃ ১০৮)

অবশ্যই – থেরাবাদীয় বৌদ্ধধর্মের লক্ষ্যকে অনেকাংশে হিন্দুধর্মের অদ্বৈতবাদের সমগোত্রীয় বলা যায়।

তাওবাদ এবং কনুফুসিয় মতবাদ হলো চীনা দর্শন ও চৈনিক ধর্মের দুটি ধারা। এর প্রথমটির প্রবর্তক হলেন লাও-জু, চ্যাং-জু প্রভৃতি মহান ব্যক্তিগণ এবং দ্বিতীয়টির প্রবর্তনা করেন স্বয়ং কনফুসিয়াস। কনফুসিয়াস তাঁর ধর্মমতে জোর দিয়েছিলেন সামাজিক দায়বদ্ধতার উপর আর লাও-জু ভালোবাসতেন স্বতঃস্ফুর্ততা এবং সহজাত সারল্যে ভরা জীবনবোধ। দুটি ধর্মের বাণীর সহিত বৌদ্ধধর্মের বাণীর অতি নিকট সম্পর্ক আছে। চীনে প্রচলিত তাওবাদী গ্রন্থ 'তাও-তে----------চিং'-এ 'চি' শব্দটির আক্ষরিক অর্থ হলো নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস। যে কোনও বস্তুর ঘন, তরল অথবা বায়বীয় অবস্থায় তার অন্তর্নিহিত 'চি' অথবা জীবনী শক্তির নির্যাস নির্গমনের উপায় হিসাবে নৃত্য ও যোগের সংমিশ্রণে এক প্রকারের শরীরী সঞ্চালন (ক্যালিসথেনিকস্) বা যোগময় (ছন্দোময়) ব্যায়ামের কথা বলা হয় এবং এই ব্যায়ামে বর্হিজগৎ হতে মনকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে 'তাও' অর্থাৎ শক্তির পথে ধাবিত করে পৌঁছান যায় দেহাতীত আত্মার জগতে। এ যেন অনেকটা হিন্দুধর্মের 'রাজযোগ' সাধনার মতো। 'রাজযোগ' সাধনার সাথে তাওবাদী ধ্যান প্রক্রিয়ার এতো মিল যে চীনা তত্ত্ববিদেরা সংস্কৃত ভাষার সাহায্য নিয়ে এই প্রক্রিয়াগুলিকে 'তাওবাদী যোগ' এরূপ নামকরণ করেছেন। আবার ভারতীয় হিন্দু যোগীরা 'তাও চিয়োও' যোগের মহাসত্যকে স্বীকার করেছেন তাঁদের সাধনায়। ভারতীয় 'হঠ যোগে' এর অনেকটা স্বাধর্ম খুঁজে পাওয়া যায়। খ্রীষ্ট জন্মের সমসাময়িক কালে বৌদ্ধধর্ম চীনে প্রবেশ করেছিল এবং তা কালের নিয়মে তাওবাদকে প্রভাবিত করেছিল। পরবর্তীতে জাপানে প্রবর্তিত 'শিন্টো' ধর্ম বা 'শিন তাও' ধর্মকেও প্রভাবিত করেছে বৌদ্ধধর্ম ও তাওবাদ যেখানে 'কামি নো মিচি' অর্থে 'দেবতার পথ'কে বোঝানো হতো।

ইহুদী (মোজেস প্রবর্তিত) ও খ্রীষ্টধর্ম (যিশু প্রবর্তিত) ভূমধ্যসাগর তীরবর্তী প্যালেস্টাইন, ইসরায়েল, ব্যবিলন এবং গ্রীস, রোম, উত্তর ইউরোপ, উত্তর-আমেরিকাকে কেন্দ্র করে বিস্তার লাভ করলেও এর জেনেসিস (মহানির্দেশ) গুলি হিন্দু বেদান্ত ধর্মের সহিত সাযুজ্যপূর্ণ। খ্রীষ্টের অবতারতত্ত্ব ও মানব উদ্ধার (salvation) এবং প্রায়শ্চিত্তবাদকে (atonement) ভারতীয় ঋষি ও অবতারদের জীবনেও সত্যরূপে সংসাধিত হতে দেখি। নীতিতত্ত্ব ও আধ্যাত্মিকতার দিক থেকে খ্রীষ্টের উপদেশগুলি বেদান্ত শিক্ষার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

ইসলাম ধর্ম হলো 'আল্লাহ্-র বাণী' এবং যার অর্থ হলো আল্লাহ্-তে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ। স্রষ্টাকে ভক্তি করা এবং সৃষ্টিকে ভালোবাসা ইসলামের শিক্ষা। আরব তথা সমগ্র বিশ্বের মুসলমানেরা বিশ্বাস করেন হজরত মহম্মদ হলেন দিব্যপ্রেরণাপ্রাপ্ত সেই ধর্মীয় প্রবক্তা যার মাধ্যমে ইসলাম আকার প্রাপ্ত হয়েছে। এই ধর্ম সাধনার মৌলিক ক্ষেত্রগুলি হলো শাহদাহ (ধর্মবিশ্বাস), নামাজ (প্রার্থনা), রোজা (উপবাস), হজ (তীর্থযাত্রা) এবং জাকাত (দান)। সাধনার এই অঙ্গগুলি ইসলামের মূল ভিত্তি এবং সন্ত, দরবেশ, ফকিরদের জীবন সাধনায় ইসলামের জীবনচর্যার মূর্ত প্রকাশ। 'সলম্' শব্দটি থেকে ইসলাম শব্দের উৎপত্তি, যার অর্থ শান্তি। সেই কারণেই সৃষ্টি কর্তাকে বলা হয় 'আস্সালাম' (শান্তির নির্ঝর) এবং 'বেহেস্ত' বা স্বর্গকে বলা হয় 'দারুস্সালাম' (শান্তির আবাস)। 'আস্সালাম্ আলায়কুম্' শব্দের অর্থ হলো 'তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক্'। ইসলামের অপর একটি নাম 'ফিৎরৎ' বা মানবধর্ম। ইসলাম বিশ্বাস করে ব্যক্তির মধ্যে যে সম্ভাবনা আছে তা একান্তভাবেই তার নিজস্ব, তার উপলব্ধির উপরেই ব্যক্তির মূল্যবোধ, সদ্গুণ এবং আধ্যাত্মিক সাফল্য নির্ভর করে। আল্লাহ্তত্ত্ব সম্পর্কিত মূল ধারনায় ইসলাম মূলতঃ ইহুদী ও খ্রীষ্টধর্মের অনুরূপ। বর্ণ সম্পর্কের প্রশ্নে ইসলাম বর্ণ সাম্যের উপর জোর দেয় এবং স্বয়ং স্বামী বিবেকানন্দ এ বিষয়ে ইসলামধর্মের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। ইসলামে বিভিন্ন বর্ণের মানুষের এক উল্লেখযোগ্য সহাবস্থান লক্ষ্য করা যায়। অর্থাৎ বর্ণ সাম্যবাদ ইসলামের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। 'ইন্নামাল মুমিমনা ইখ্ওয়াতুন্' অর্থাৎ - 'নিশ্চয় বিশ্ববাসীগণ তোমার ভ্রাতা' (ইসলাম ধর্মে ও সমাজে এ সত্য প্রতিফলিত হয়েছে নামাজ ও জাকাতের মধ্যে দিয়ে) কথাটি ব্যবহারিক ক্ষেত্রে ইসলামে যেভাবে কার্যকর হয়েছে হিন্দুধর্মে সেভাবে হয়নি অথচ বিবেকানন্দ দেখেছিলেন বেদান্তের অদ্বৈতবাদেও রয়েছে উচ্চস্তরের সাম্যচিন্তা। এই ইসলামী সাম্যবাদকে ভারতীয় হিন্দু ধর্মে গ্রহণের পক্ষপাতী ছিলেন স্বামীজী। তিনি মনে করতেন বেদান্তের মস্তিষ্ক (তত্ত্ব) ও ইসলামের দেহ (সামাজিক সংহতি) এই উভয়ের সমন্বয়েই গড়ে উঠতে পারে আদর্শ সমাজ। তাঁর এ ভাবনায় এক অতি উজ্জ্বল ধর্মনিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় মেলে। অন্যদিকে ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সুফী সাধক সন্ত বুল্লহে শাহ্ জীবনের শেষ প্রান্তে এসে অনুভব করেছিলেন একই আল্লাহ্ মহম্মদ, খ্রিষ্ট, কৃষ্ণ, পথ-ভিখারী সকলের মাঝেই রয়েছে। তাই বলেছিলেন :

'বৃন্দাবন মেঁ গৌ চরাবে!
লঙ্কা চড়কে নাদ্ বজাবে।।
মক্কে দা বন্ হাজি আবে।
বাহ্ বাহ্ রং বটাইদা;
হুণ কি থীঁ আপ ছপাইদা।।' ('কানুন-ই-ইশক্')

আমরা সন্ত কবীর, লালন শাহ্, কাজি-নজরুল ইসলাম বা শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবনাতেও এমনই ধর্মনিরপেক্ষ সর্বধর্ম সমন্বয়ী চেতনার বহিঃপ্রকাশ দেখতে পাই। বিবেকানন্দ প্রবর্তিত 'জীবে দয়া' বা 'জীব সেবাই শিব সেবা'র পথটিও ইসলামেরই অন্যতম আদর্শের অনুসরণ।

শিখধর্মের প্রবক্তা গুরু নানক ('নানক' শব্দের অর্থ 'অগ্নি') পাঞ্জাবের পথে পথে ঘুরে শিখ ধর্মের তত্ত্ব প্রচার করেন। 'গুরু গ্রন্থসাহিব' শিখকূলের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ। ইসলামের সদৃশতায় শিখধর্মে অবতারবাদ, জাতিভেদ প্রথাকে অস্বীকার করা হলেও হিন্দুধর্মের ন্যায় শিখধর্মেও পুনর্জন্মবাদ স্বীকৃত। নানক যেমন উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত হিন্দুত্বকে মূল্যদান করেছিলেন তেমনই ইসলামের মর্যাদাকেও তিনি স্বীকার করেছিলেন। এখানেও তাঁর ভারতীয় ধর্মনিরপেক্ষ দৃষ্টি ও সর্বধর্ম সহিষ্ণুতার পরিচয় মেলে।

আধুনিক ভারতবর্ষে বহু আধ্যাত্মিক পরিত্রাতার জন্ম হয়েছে। তাঁরা প্রত্যেকেই দিব্যগুণাবলীর মূর্ত প্রতীক ছিলেন। দ্বাপর যুগের রাজা শ্রীকৃষ্ণ অথবা অযোধ্যারাজ অবতার শ্রীরামচন্দ্রের বাণী অথবা ধর্মাদর্শ থেকে শুরু করে মধ্যযুগের যুগনায়ক শ্রীচৈতন্যদেবের ভক্তি ও মানবপ্রেমের অনুসঞ্চার ঘটেছিল তাঁদের জীবন ও কর্মে। যে আধ্যাত্মিক ভাবাদর্শের তরঙ্গ সৃজনে বর্তমান ভারত ভগবৎ মহিমায় উত্তীর্ণ হয়েছে তারই অন্যতম প্রবাদ-পুরুষ হলেন ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব। স্বামী অভেদানন্দ বলেন :

> "শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনোদ্দেশ্য হলো এক সার্বভৌম ও শাশ্বত সত্য প্রচার করা। সেই সত্য হলো যদিও এই ব্রহ্ম এক এবং অদ্বিতীয় তথাপি ইনি বিভিন্নরূপে বিরাজমান এবং এই বিরাট পুরুষেরই পূজা করে বিভিন্ন জাতি, বিভিন্ন রূপ ও নামে। বর্তমানে যে আধ্যাত্মিক জোয়ারের উৎক্ষেপণ তথা তরঙ্গ প্রায়

অর্ধেক জগৎকে পরিব্যপ্ত করে আমেরিকার তীর দেশ স্পর্শ করেছে তা যীশুর ন্যায় চরিত্রবান ও দিব্য ব্যক্তির সম্পন্ন ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের দ্বারা উৎপন্ন হয়েছিল, যিনি আজকের ভারতবর্ষে দিব্যভাবের আদর্শ বিকাশ হিসাবে সম্মানিত ও পূজিত।" (শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণী, পৃঃ ১০)

শ্রীরামকৃষ্ণের যে সার্বভৌম সত্যটি সমগ্রটি বিশ্বে প্রচারিত তা হলো 'যত মত তত পথ' অর্থাৎ 'যত প্রকার বিশ্বাস, তত প্রকার অভ্যাস' রূপে খ্যাত। শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবনার গুরুত্ব এখানেই যে তিনি ভারত তথা বিশ্বের বিভিন্ন ধর্মীয় মতবাদ ও আধ্যাত্মিক সাধনাগুলিকে একটির মধ্যে সমন্বিত বা Synthesise করেন নি, বরং বিভিন্ন পরিপূরক সাধনার মধ্যে যে কোন একটিকে অবলম্বন করে ঈশ্বর সাধনার চরম লক্ষ্যে পৌঁছানোর কথাই বলেছেন। স্বামী অভেদানন্দ তাঁর 'মেময়র্স' বা 'গসপেল' গ্রন্থের আমেরিকা সংস্করণে দেখিয়েছেন যে শ্রীরামকৃষ্ণের জ্ঞান, ভক্তি, ধর্ম ও যোগের বিষয়গুলি স্বতঃই একে অপরের পরিপূরক। পার্থক্য শুধু সাধকের বিশ্বাস, রুচি ও দৃষ্টিভঙ্গির এবং সবই মিলে-মিশে অখন্ড ব্রহ্মস্বত্ত্বার স্বরূপ উপলব্ধিতেই সাহায্য করে। তাই হয়তো 'The Life of Ramkrishna' (১৯২৯) গ্রন্থের রচনাকার রম্যাঁ রঁলা উপলব্ধি করেছিলেন –

"The total unity of this river of God, open to all rivers and all streams."

শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁর নিজ জীবনে ইসলাম ও খ্রিষ্টীয় ধর্মসাধনা করেছিলেন। একসময় ঠাকুর বলতেন :

"হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে যেন একটা বিরাট পর্বতপ্রমাণ ব্যবধান রয়েছে – পরস্পরের চিন্তাপ্রণালী, ধর্ম বিশ্বাস ও কার্যকলাপ পরস্পরের কাছে সম্পূর্ণ দুর্বোধ্য হয়ে রয়েছে।"

(সবার ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ, পৃঃ ২৬ ও শ্রীরামকৃষ্ণ জীবনী, পৃঃ ৭৬)

যেন সেই কারণেই তিনি ১৮৬৬ সালে জনৈক সুফী ধর্মাবলম্বী নিষ্ঠাবান সাধক গোবিন্দ রায়ের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েন ও ইসলাম ধর্ম সাধনার প্রবৃত্ত হন। ইসলাম ধর্মের প্রতি শ্রীরামকৃষ্ণের এই আনুগত্যের বিষয়টি বিচার করে আধুনিক সমালোচক বলেন :

"বৈদান্তিক যেরূপ জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকল নর-নারীকে একই ব্রহ্ম বা আত্মস্বরূপ বলিয়া জ্ঞান করেন, ইসলামধর্মীগণ সমাজের দিক দিয়া তাঁহাদের ধর্মাবলম্বিগণকে সেইরূপ ভ্রাতৃভাবে দেখিয়া থাকেন এবং তদনুরূপ ব্যবহার করেন। বলাবাহুল্য বেদান্তের এই আত্মিক ঐক্য ও অভেদত্বমূলক সাম্য-মৈত্রী ও সমদর্শন এবং ইসলামের সামাজিক সাম্য, ভ্রাতৃত্ব ও সমদর্শিতা মিলিত হইয়া এক পূর্ণাঙ্গ ভারত গড়িয়া তুলিবে। সমন্বয়াচার্য শ্রীরামকৃষ্ণের ইসলাম ধর্ম সাধনার পূর্ণ সার্থকতা ইহারই মধ্যে সুস্পষ্ট সূচিত হইতেছে।" (রামকৃষ্ণ সংঘ : আদর্শ ও ইতিহাস, পৃঃ ৩৪-৩৫)

'ঈশামসি' অর্থাৎ ভগবান যিশু সম্পর্কে শ্রীরামকৃষ্ণের অনুরাগটিও পূর্বানুরূপ। কলিকাতার সিঁদুরিয়াপটি পল্লীনিবাসী ব্রাহ্মধর্মানুরাগী দানশীল শ্রীযুক্ত শম্ভুচরণ মল্লিকের সহিত পরিচয় ও তাঁহার নিকট বাইবেল শ্রবণ পূর্বক ঠাকুর খ্রিষ্টীয় ধর্মতত্ত্ব সম্পর্কে উৎসাহী হন। এসময় তিনি সকল হিন্দুধর্ম সংস্কার বিবর্জন করে সম্পূর্ণভাবে সমাধি কল্পে নিযুক্ত হন এবং অবশেষে শ্রীশ্রীঈশার অবতারত্ব সম্বন্ধে নিঃসংশয় হন।

ভগবান বুদ্ধ সম্পর্কে হিন্দু সাধারণের বিশ্বাস মতো শ্রীরামকৃষ্ণদেবও তাঁকে ঈশ্বরাবতার বলে শ্রদ্ধা ও পূজা করতেন। পুরীধামস্থ শ্রীশ্রী জগন্নাথ-সুভদ্রা-বলভদ্র রূপে ত্রিরত্নমূর্তিতে শ্রীভগবান বুদ্ধের প্রকাশ অদ্যপি বর্তমান বলে বিশ্বাস করতেন তিনি। জৈনধর্মের সকল তীর্থঙ্কর সহ, শিখধর্মের গুরু নানক থেকে শুরু করে গুরু গোবিন্দ পর্যন্ত সকল শিখগুরুদের প্রতিই তাঁর শ্রদ্ধা ছিল অটুট। শিখদের দশগুরু সম্পর্কে শ্রীরামকৃষ্ণের উক্তি ছিল :

"তাঁহারা সকলে জনক ঋষির অবতার – শিখদিগের নিকট শুনিয়াছি, রাজর্ষি জনকের মনে মুক্তিলাভ করিবার পূর্বে লোককল্যাণ সাধন করিবার কামনা উদয় হইয়াছিল এবং সেজন্য তিনি গোবিন্দ পর্যন্ত দশগুরুরূপে দশবার জন্মগ্রহণ করিয়া শিখজাতির মধ্যে ধর্মসংস্থান পূর্বক পরব্রহ্মের সহিত চিরকালের নিমিত্ত মিলিত হইয়াছিলেন।"

(শ্রীরামকৃষ্ণ জীবনী, খ্রিষ্ট্রীয় ধর্মসাধন ও ডাকাত বাবার কাহিনী, পৃঃ ৯৬)

এসময় ব্রাহ্ম সমাজের মতো গোঁড়া সংস্কারপন্থীদের নানা ইংরেজী ও বাংলা পত্রিকা যথা : 'সুলভ সমাচার', 'সানডে মিরর', 'থিস্টিক কোয়াটারলি রিভিউ' – প্রভৃতি পত্রিকাতে ঠাকুরের সর্বধর্ম সমন্বয়ী সারগর্ভবাণী ও আলোচনা প্রকাশিত হয়। জীবনের প্রায় বারো বৎসর শ্রীরামকৃষ্ণ অনুসন্ধিৎসু বৈজ্ঞানিকের ন্যায় বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ধর্মবিশ্বাস ও ধর্ম পদ্ধতিগুলি বিশ্বাস ও নিষ্ঠার সহিত পালন করেছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী ও মতগুলিকে প্রত্যক্ষ করলে বোঝা যায় তা আধুনিক ভারতের ধর্ম নিরপেক্ষতার প্রশ্নে কতখানি বৈজ্ঞানিক চিন্তাসম্পন্ন ও যুক্তিপূর্ণ। ঠাকুরের মতে ব্রহ্ম ও শক্তি অভেদ, অগ্নি ও তার দাহিকাশক্তি যেমন পৃথক নয়, দুগ্ধ ও তার ধবলত্ব যেমন আলাদা নয়, তেমনি সাকার ও নিরাকারের প্রভেদ সম্পর্কে – 'নিরাকার জল জমিয়া সাকার হওয়া' অথবা 'শোলার আতা দেখিয়া যথার্থ আতা মনে পড়ার ন্যায় সাকার মূর্তি অবলম্বনে ঈশ্বরের যথার্থ স্বরূপের প্রত্যক্ষ জ্ঞানে পৌঁছানো' ইত্যাদি বিষয়গুলি হিন্দু তথা ব্রাহ্ম ও ইসলামধর্মের প্রভেদত্বকে একেবারে মুছে দেয় কারণ ঈশ্বর স্বরূপকে কেবলমাত্র সাকার বলে নির্দিষ্ট করায় যে দোষ, শুধুমাত্র নিরাকার সগুণ বলে নির্দেশ করাতেও সমদোষাবহ হয়। ঈশ্বর অনাদিতে সাকার জগৎ রূপে ব্যক্ত, নিত্য, চলিষ্ণু, আর আদিতে ব্রহ্মস্বরূপে নিরাকারে জগতের নিয়ামক শক্তি রূপে অব্যক্ত অথবা ব্যপ্ত অর্থাৎ সর্বগুণের অতীত। ঠাকুরের কথায় :

> "ঈশ্বর স্বরূপের ইতি করিতে নাই, তিনি সাকার, তিনি নিরাকার (সগুণ) এবং তাহা ছাড়া তিনি আরও যে কি, তাহা কে জানিতে পারে?" (শ্রীরামকৃষ্ণ জীবনী, পৃঃ ১০৬)

অন্যদিকে ঠাকুর যখন বলেন :

> "ঈশ্বরকে ভালোবাসাই মানব জীবনের উদ্দেশ্য" (শ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত – শ্রীম কথিত, ৩য় ভাগ, ১ম খন্ড)

তখন মানবপ্রেম ও ঈশ্বর প্রেম বস্তুতঃই এক হয়ে যায়। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণী তথাকথিত ছোঁয়াছুঁয়ির বালাই, সাম্প্রদায়িক গোঁড়ামি ও ধর্মোন্মত্ততার অবসান ঘটিয়ে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে এক মহান ঐক্যের সূচনা করেছিল এবং তা সকল ধর্মীয় অবিশ্বাসকেও দূর করেছিল। এদিক থেকে রামকৃষ্ণের প্রভাব জনজীবনে ছিল পরাবিজ্ঞানের মতোই।

ধর্মনিরপেক্ষতা ও সর্বধর্মসমন্বয়ের প্রশ্নে ভারতবর্ষ চিরকাল তার উদারতা প্রদর্শন করেছে। গীতায় ভগবান বলেছেন :

> "শ্রেয়ান স্বধর্মো বিগুণ : পরধর্মাত্ স্বনুষ্ঠিতাত
> স্বধর্মে নিধনং শ্রেয় পরধর্মো ভয়াবহ।। (গীতা ৩/৩৫)

সমস্ত ধর্মই তত্ত্বৎ সম্প্রদায়ের নিকট বড়। আজ আমরা সমস্ত ধর্মকে শুধু সহ্যই করি তা নয়, বরং সত্য বলে বিশ্বাসও করি। আজ আমরা জানি, মানবজাতির শেষ পরিণতি হলো ভগবানের সঙ্গে পুনর্মিলন। দয়া, প্রেম, মানবতাই হলো সেই মিলনের পথে পৌঁছাবার একমাত্র সহজ উপায়। পরের উপকারই ধর্ম, পরপীড়নই পাপ। স্বাধীনতাই ধর্ম, পরাধীনতাই পাপ। অপরকে ভালোবাসাই ধর্ম, অপরকে ঘৃণা করাই পাপ। ঈশ্বরে ও নিজ আত্মার প্রতি বিশ্বাসই হলো ধর্ম, সন্দেহই পাপ। অভেদ দর্শনই হলো ধর্ম, ভেদ দর্শনই পাপ। সর্বজনীন ধর্ম কোনো দেশ-কালে সীমাবদ্ধ থাকে না। যে অসীম ভগবানের কথা কোনো ধর্মে প্রকাশিত হয় তাকে তারই মতো অসীম ও উদার হতে হয়। তাই আধ্যাত্মিকতার নীলকান্তমণিকে তথাকথিত ধর্মের বাক্সে কখনই বন্দী করে রাখা যায় না। এই হলো সকল ধর্মের মূল কথা।

গ্রন্থ ঋণ :

স্বামী সর্বভূতানন্দ – 'জগতের ধর্মমত', রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট্ অব্ কালচার, জুন ২০১১
স্বামী তেজসানন্দ - শ্রীরামকৃষ্ণ জীবনী, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, জুন ২০০৯
স্বামী অভেদানন্দ - শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণী, শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, জুলাই ২০০৮
স্বামী সর্বভূতানন্দ – সবার ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ, রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট্ অব কালচার, জুলাই ২০১০
স্বামী অভেদানন্দ – যুগে যুগে যাঁদের আগমন, শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, জানুয়ারী ২০০৪